শবমানুষের গল্প

সমীরণ সামন্ত

ব ই ব ন্ধু

ভূমিকা

অজানার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভয়। এটাই সত্য। নিশুতি রাতে একা হেঁটে যাওয়া অথবা নতুন কোনো ঘরের মধ্যে একাকী লোডশেডিং-এ সময় কাটানো, দুটোর মধ্যেই ভয় পাওয়ার একটা সুপ্ত কারণ লুকিয়ে থাকে। যতক্ষণ না অন্ধকার থেকে কোনও অবয়ব বেরিয়ে আসছে, ভয়ের অনুভূতি ঠিক ততক্ষণই কার্যকরী থাকে। অজানার স্বরূপ জানতে গিয়ে মনের অন্দরমহলে চক্রাকারে যে জোয়ার-ভাটা চলতে থাকে, সেখানে জন্ম নেয় তৃতীয় এক সত্তা। বাস্তবকে খুন করে সূচনা হয় অবাস্তব এক ষড়যন্ত্রের, যার আপাদমস্তক কল্পনার মায়াজাল মাত্র। কিন্তু আসলে কি এই অনুভূতিগুলি মিথ্যা?

দেশ বিদেশের অনেক লেখকের গল্পের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি। তাঁদের মধ্যে সব থেকে বেশি যে লেখকের নাম মনে পড়ে, স্যার অ্যালফ্রেড জোসেফ হিচকক। বেশিরভাগ গল্প মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর তৈরি হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ষড়রিপু তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। তাঁর গল্প অথবা সিনেমায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা সকল মানুষকে চমকে দেয়, সেটা হল গল্পের শেষের মোচড়, ইংরেজিতে বলে ট্যুইস্ট। ভালোলাগার চেয়ে অবাক হতাম বেশি।

সেই সব চমক আমি মাথায় রেখেছি। নিজের ভাষায় 'ভয়'কে নবরূপে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। এই বই জুড়ে এমনই কিছু আখ্যান রয়েছে, যেখানে ভয় তার চেহারা পরিবর্তন করেছে, শঙ্কার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তৈরি হয়েছে আশঙ্কা। পলকের ঘটনা পাঠকের অজান্তেই কলেবর বড় করে ফেলেছে। পাঠক যতক্ষণে বুঝবে, ঘটনা প্রথমের মত স্বাভাবিক আর থাকছে না, ততক্ষণে

হয়তো ঘটে যাবে আরও একটি গা শিরশিরে অভিজ্ঞতা।

'ভ'-এ ভালোলাগা, 'ভ'-এ ভয় পাওয়া। দুটোই যদি পাঠক-পাঠিকাদের মনে সঞ্চার হয় এই বইয়ের মাধ্যমে, তাহলেই স্বার্থক বলে মনে করব নিজের সৃষ্টিগুলো। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে গল্পের শেষ পরিণতি তথা মোচড় আবশ্যক। আশা রাখছি সেই স্বাদ থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না।

সবাইকে স্বাগত জানাই, 'শবমানুষের গল্প'-এর জগতে, যেখানে সব গল্পই মানুষের। হয়তো সে জীবিত, নয়তো...

—সমীরণ সামন্ত

সূ চি প ত্র

শুনব তোমার কথা	১১
নীলাম্বরী	২৫
অপেক্ষা	৩৮
শুধু ভালোবাসার জন্য	৪৪
আসব আরেকদিন, আজ যাই	৫৫
তিলোত্তমার কটেজ বাড়িতে	৭২
রোগী	৮৬
জিঘাংসা	১০৪
মায়ের মেইড	১১৪

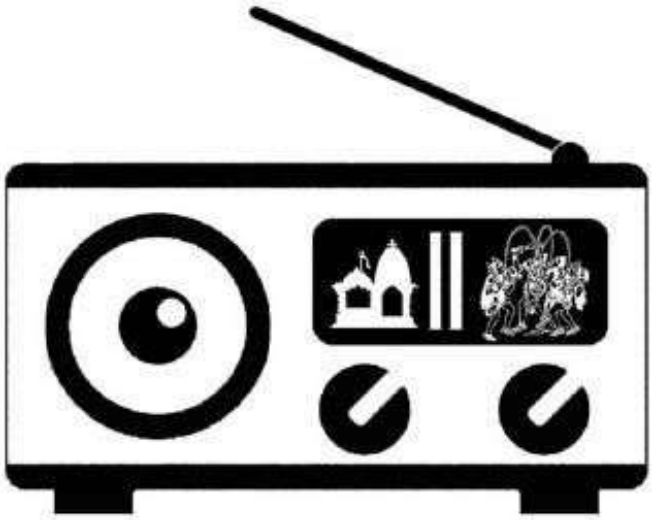

শুনব তোমার কথা

"হ্যালো এভ্রিওয়ান, আমি তোমাদের কিয়া। চলে এসেছি আরও নতুন একটা এপিসোড নিয়ে তোমাদের জন্য—যার নাম, 'শুনব তোমার কথা।' যেখানে তুমি এসে নিজের মনের ভেতরে থাকা হাসি-কান্না-দুঃখ-রাগ অথবা আনন্দ সব্বার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারো। এখানে কেউ কিছু বলার নেই। কেউ তোমায় বলবে না, এটা বলা তোমার ঠিক হয়নি। এটাই সেই প্লাটফর্ম–যেখানে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলতে পারো। ইভ্ন আমিও সেসব নিয়ে তোমায় কিছু বলব না। বরং যত মনের কথা খুলে বলবে, ততই অ্যাপ্রিসিয়েট করব। তাহলে আর দেরি কেন? চটপট ফোন করো এই নাম্বারে। আমি অপেক্ষায় রইলাম।"

হেডসেটটা কানের থেকে কাঁধে নামিয়ে কিয়া একটা ক্লাসিক গানের ইন্সট্রুমেনটাল চালিয়ে দিল হালকা আওয়াজে।

এখন রাত্রি এগারোটা বাজে। কিয়ার এটা রোজের রুটিন। রবিবার বাদে। বছর ছাব্বিশের মেয়েটি পার্ট টাইম রেডিওজকি। আগে ফুল টাইমে এই এফএম চ্যানেলে ছিল। কিন্তু আরও একটা চাকরির অফার আসে, ভোক্যাল আর্টিস্টের জন্য। দুটো কাজ একসঙ্গে করা তো সম্ভব নয়। একদিকে নেশা আর অন্য দিকে পেশা। কিয়া দুটোকেই বেছে নিয়েছে। গলা যেহেতু সুন্দর, তাই রেডিও চ্যানেল থেকেও ওকে ছাড়তে চায়নি। অন্ততপক্ষে দিনে একটা শো করুক–

সেটাই বসের আবদার ছিল। তবে মাঝে মধ্যে ছুটি থাকলে অন্যদের প্রক্সিও দিয়ে দেয়।

আজকের দিনে 'কিয়া' নামটা শুনলেই শহরে বেশ একটা হইচই পড়ে যায়—এমনই একটা ফ্যান বেস তৈরি হয়ে গিয়েছে। সবাই বলতে গেলে ওই রাতের শোয়ের জন্য নয়, বিশেষ করে কিয়ার গলা শোনার জন্যই অপেক্ষা করে। মেয়েটার কাছে ছুটি থাকলেও নেশা ওকে ছুটিয়ে ছাড়ে।

ছোটোবেলায় মা মারা যাওয়ার পর আস্তে আস্তে নিজে থেকেই বড়ো হয় একটি হোমে। বাবার কথা না বলাই ভালো। সে তো থেকেও ছিল না। একা কিয়া বড়ো হতে হতে পেয়েছিল অনেক চড়াই-উতরাই পথের অভিজ্ঞতা। হোমে থাকতে থাকতে ভাই-বোনের অভাবটাও মিটে গিয়েছিল। ভালো পড়াশোনা করে সেই বছর টপ র‍্যাঙ্কিং করে সরকারি সাহায্যে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকা সেই মেয়েটি আজকের বিখ্যাত আরজে কিয়া।

সারাদিনের কাজের শেষে বাড়ি ফেরার আগে দুই ঘণ্টা এফএম স্টেশনে। তারপর বাড়ি ফিরে ঘুমোতে ঘুমোতে সেই রাত দুটো। একটা দুই চাকা কিনে ফেলেছে মাসখানেক হতে চলল। কিয়ার পয়সা জমানোরও হাত রয়েছে।

এই শোয়ের আইডিয়াটা বলতে গেলে কিয়ার কাছ থেকেই এসেছে। পৃথিবী ঘুরছে। তার সঙ্গে পৃথিবীর বাসিন্দারা দৌড়ে চলেছে। কেউ চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে, কেউ বা ন-টা-ছ-টার ডিউটি করছে। আবার কেউ শাশুড়ি, ঘর দুটোই সামলাচ্ছে, কেউ বা অন্যের ঘর পাহারার কাজ পেয়েছে। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত সারাদিন ধরে। সামান্য একটু অর্থের জন্য, অর্থের বিনিময়ে। কিন্তু কেউ কি ওদের কথা শোনে? ওদের ভেতরে জমে থাকা হাসি-আনন্দ-কান্না অথবা রাগের অনুভূতিগুলো কি ওরা কাউকে ব্যক্ত করতে পারে? কথা না বলতে বলতে, কাউকে নিজের ভেতরের অনুভূতিটা প্রকাশ না করতে করতে এক প্রকার মেন্টাল ব্লকেজ তৈরি হয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে কেউ সেটা আমল দেয় না। কিন্তু সেটাই সাংঘাতিক সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে পরবর্তী সময়ে। কিয়ার জীবনেও এমন ঘটেছে। খুব ভালো করেই জানে এই সব সমস্যার প্রতিক্রিয়া কতটা খারাপ। সেই ভাবনা—এমন একটা জায়গা তৈরি হোক, যেখানে মানুষ মন খুলে কথা বলতে পারবে। দুই ঘণ্টার শো। যদি একজন কলার একটু বেশি সময় ধরে কথা বলতে চায়, বলুক না। তার মনটা হালকা হবে। আর যাইহোক একজন মানুষেরও হেল্প তো করতে পারল, এমনটা ধরে নেবে। তবে কিয়ার

জন্য একটাই আদেশ ছিল। কল যদি লং হয়, মাঝে যেন একটা ব্রেক নেয়। আর সেই কলে যেন তেমন ধরনের কথোপকথন হয় যেটা শ্রোতারা শুনতেও পছন্দ করবে। কিয়া বুঝে গিয়েছিল ওকে ঠিক কী করতে হবে। নতুন পদক্ষেপ হলেও এত বছরের আরজে-এর কাছে ব্যাপারটা খুব মোটিভেট করছিল ভেতর থেকে।

আজ শনিবার। আজকের দিনটা খুব একটা কলার আসে না। কারণ উইকেন্ড। সবাই কোনও না কোনওভাবে নিজের বিজি শিডিউল থেকে ছুটি পেয়েই যায়। তাই আজ মন খারাপ আর ভালো, যেটাই হোক, কোলকাতা আজ স্যাটারডে নাইটস পালন করছে।

নীলাম অন এয়ার হয়ে গিয়েছে মিনিট দুয়েক। সপ্তাহের এই একটা দিন নীলাম একাই থাকে। শো কমপ্লিট হওয়ার পর, যাওয়ার আগে ফ্রন্টাল অফিসের গেটটা লক করে নিচে অফিসের দুইজন গার্ডের যেকোনও একজনকে হ্যান্ডওভার করে যায়। আজ অবশ্য একজন এসেছে।

"হ্যালো, আমি কার সঙ্গে কথা বলছি একটু জানতে পারি?" এখনই একটা কল এসে গেছে। প্রতিবার কিয়া এই ভাবেই রিসিভ করে।

"হ্যালো..."

গলাটা একটি মেয়ের। তীক্ষ্ণতা বেশি, কিন্তু ভয়েসটা একটু নিচু ভাবে আসছে। ঘাবড়ে গেলে যেমন একটি মেয়ে কথা বলে, এটাও কিছুটা সেরকমই। তবে সেক্ষেত্রে অনেক সময় তুতলে যায়। মেয়েটি কিন্তু সেটা করেনি। বরং বলার মধ্যে একটা কনফিডেন্স রয়েছে। কিন্তু বলতে গিয়ে প্রথম প্রথম যা হয় আর কি।

"হ্যাঁ বলুন, আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনি কোথা থেকে বলেছেন?"

"আমি, আমি অনিলিখা বলছি, রাসবিহারি থেকে। আমি কি কিছু এখানে বলতে পারি?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আপনার যা মনে আসে, বলুন। আমি তো রয়েছি আপনার কথা শোনার জন্য। ভুল বললাম, শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে গোটা কোলকাতা রয়েছে, আপনাকে শুনবে বলে। বলুন আপনার কথা।"

"আমি কিন্তু একটা হাসির গল্প বলতে চাই। আমার নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা। সেটা কি এখানে আমি শেয়ার করতে পারি?"

"একদম, নিঃসন্দেহে। তাহলে চলুন শুনে নিই অনিলিখাদির হাসির গল্প।"

অনেক দিন পর এমন একজন কলার পেয়ে কিয়া মনে মনে খুব খুশি হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রাতে কেউ মনের দুঃখ নিয়ে, কেউ বা নিজের ভেঙে যাওয়া সংসার বা প্রেম নিয়ে গল্প করে। অথবা কেউ নিজের চাকরি হারানোর গল্প বলে অথবা কেউ বলে এমন কিছু যেটা চোখের কোণে জল এনে দেয়। কিন্তু এতদিন পর, হয়তো এই প্রথমবার এমন কাউকে পেল, যে হাসির গল্প বলতে চায়। কাহানি মে টুইস্ট।

"আপনি আমাকে দিদি বললেন, অনেক ধন্যবাদ কিয়া। আমি আপনার থেকে বড়োই হব অবশ্য। তো যাইহোক, গল্প শুরুর আগে আমি কিছু বলতে চাই। আমার এই গল্পের দুটো পার্ট। প্রথম পার্টে আপনাদের মনে হতে পারে আমি একটা অপ্রাসঙ্গিক কোনও গল্প বলছি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা বললেই আমার ঘটনার সঙ্গে রিলেট করতে পারবেন। তাই গল্প শুরুর আগে একটাই কথা, আমাকে প্লিজ বলতে দেবেন। থামিয়ে দেবেন না।"

"বেশ তাই হবে।"

অনিলিখা শুরু করল।

"আজ থেকে প্রায় বছর বারো আগেকার কথা। তখন আমরা থাকতাম বিষ্ণুপুরে। জায়গাটি বীরভূম জেলায় অবস্থিত। এখন কোলকাতার মানুষজন যে জায়গায় সখে-সাধে ঘুরতে যায় প্রতি বছরই। সেই জায়গাটি ছিল আমার মাটি। লালমাটি ছিল আমার প্রাণ। আর একটা প্রাণ ছিল, আমার ভাই কুশল। বয়সে আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোটো।

"বিষ্ণুপুরের সব কিছু আমার এখনও নখদর্পণে। সেই সময়ে মাঝে মধ্যে টুরিস্টদের সঙ্গে দেখা হলেও গল্প করতাম। ওরা আমাদের গ্রামের ব্যাপারে জানতে চাইত। খুব মজা হত জানেন তো। আমার ভাই আমার সঙ্গেই থাকত। সকাল হলেই দুজনে মিলে সারা গ্রাম চষে বেড়াতাম। আমি স্কুলে যেতে পারিনি। কিন্তু ভাইকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হল। আমার তাতে কোনও রাগ ছিল না। বরং ভাইয়ের কাছ থেকে অল্প অল্প করে নামতা, নিজের নাম সই করা সব শিখেছিলাম। ভাইও আমাকে শিখিয়ে দিত। দুজনে তাইতো মাঝে মধ্যে ইস্কুল ইস্কুল খেলতাম। অনেকেই হয়তো জানে বিষ্ণুপুরে একটি দলমাদল কামান সেই ইংরেজ আমল থেকে রয়েছে। খুব বিখ্যাত। কিন্তু এর পাশেই একটি মন্দির রয়েছে। খুব বিখ্যাত। সারা ভারতে এই মন্দির হাতে গোনা। তার